সাপ্তাহিক বর্তমান

৫ ডিসেম্বর ২০১৫ • দাম ৮ টাকা

# শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানে যেত

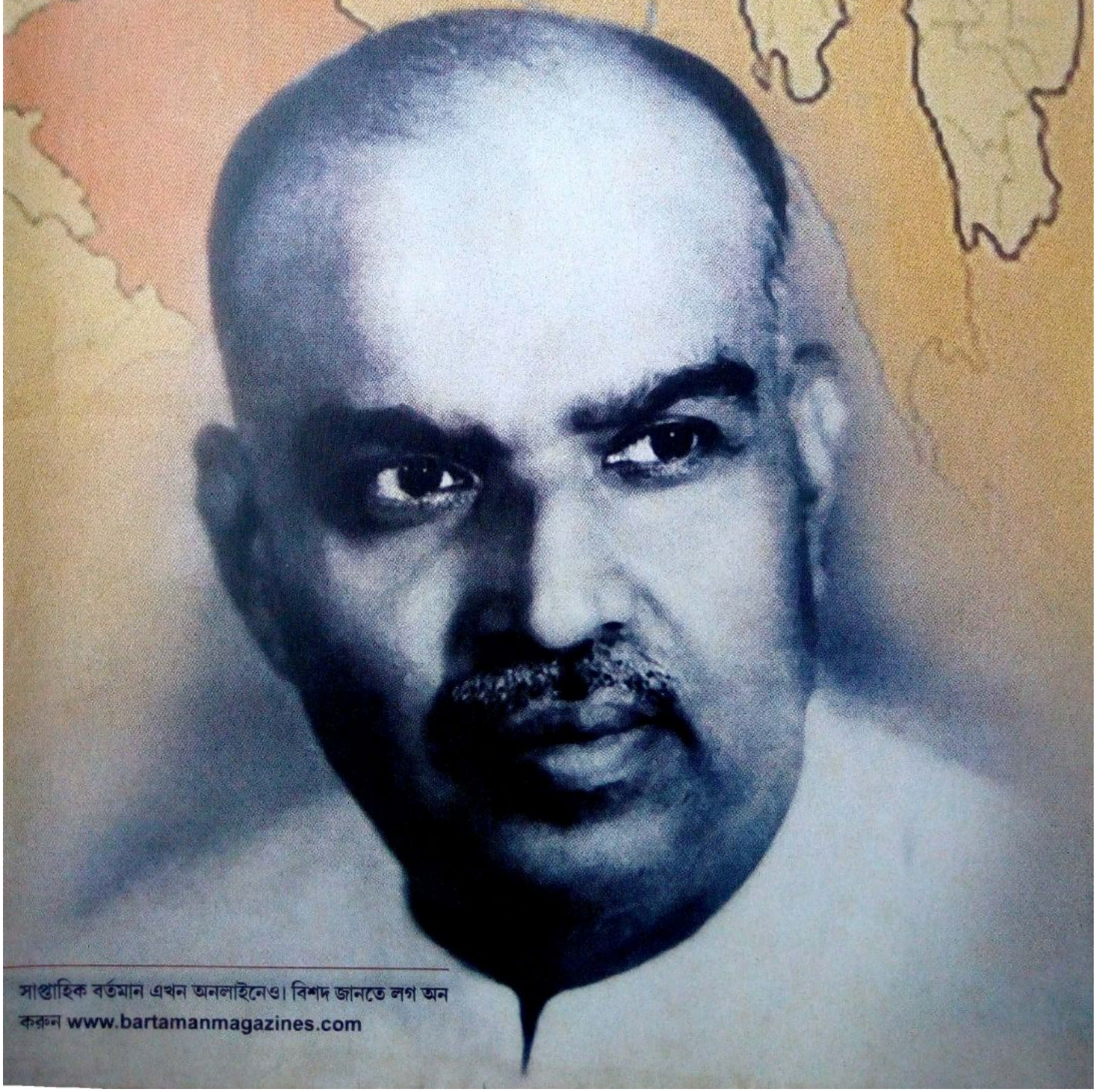

সাপ্তাহিক বর্তমান এখন অনলাইনেও। বিশদ জানতে লগ অন করুন www.bartamanmagazines.com

Scanned by CamScanner

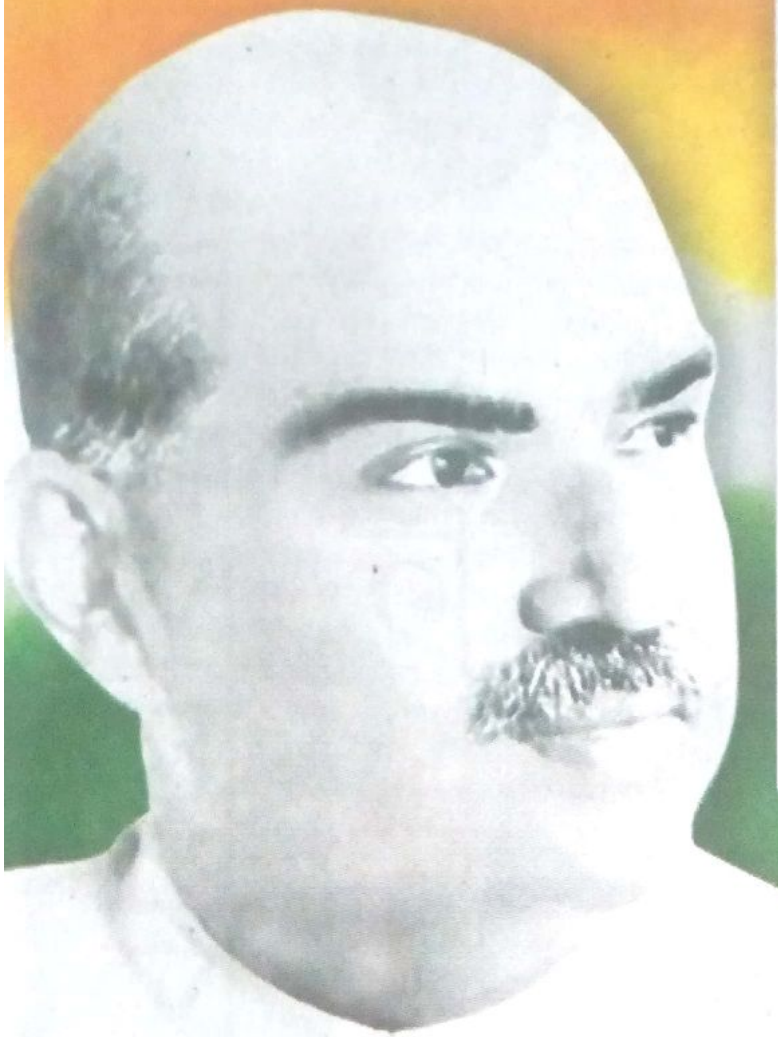

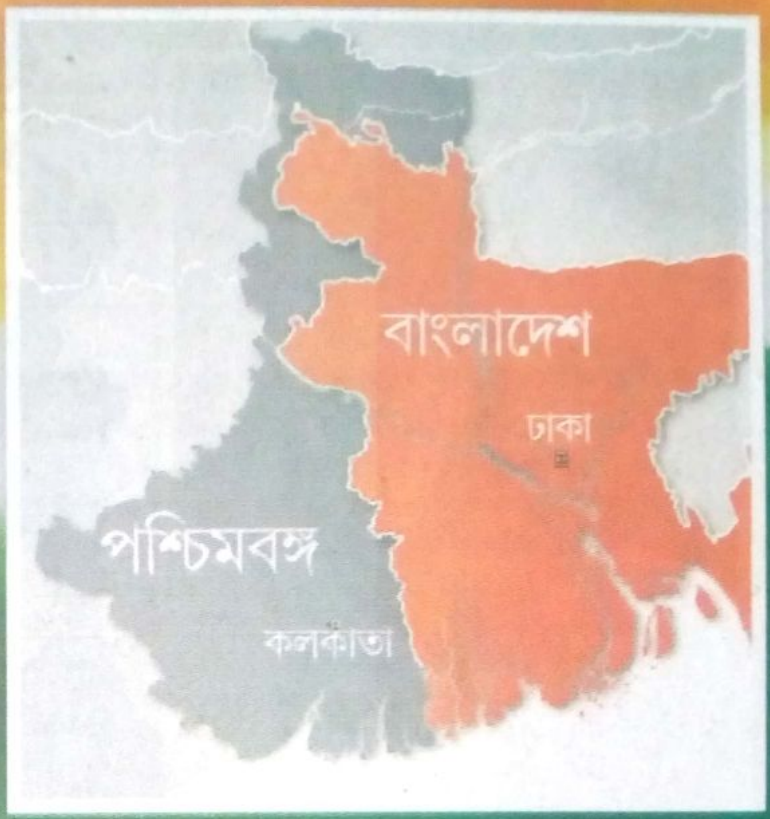


# শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানে যেত

১৯৪৭ সালে বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগের ভিতর দিয়ে ভারত ভাগ পর্বটি সম্পন্ন হয়। অবিভক্ত বাংলার পূর্ব অংশটি পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। পশ্চিম অংশটি থেকে যায় ভারতে। মহম্মদ আলি জিন্নাহ অবশ্য চেয়েছিলেন সমগ্র বাংলাই পাকিস্তানের মুঠোয় রাখতে। সে জন্য ১৯৪৬ সালে কলকাতা আর নোয়াখালিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। জিন্নাহ-র আগ্রাসী থাবা থেকে সেদিন পশ্চিমবাংলাকে ছিনিয়ে এনেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। লিখেছেন **রন্তিদেব সেনগুপ্ত**।



Scanned by CamScanner

# পশ্চিমবাংলার জন্ম শ্যামাপ্রসাদ তাঁর

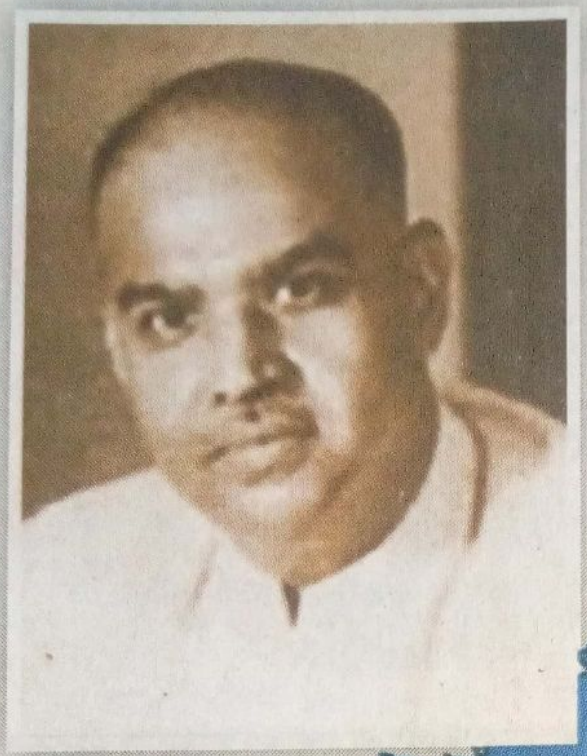

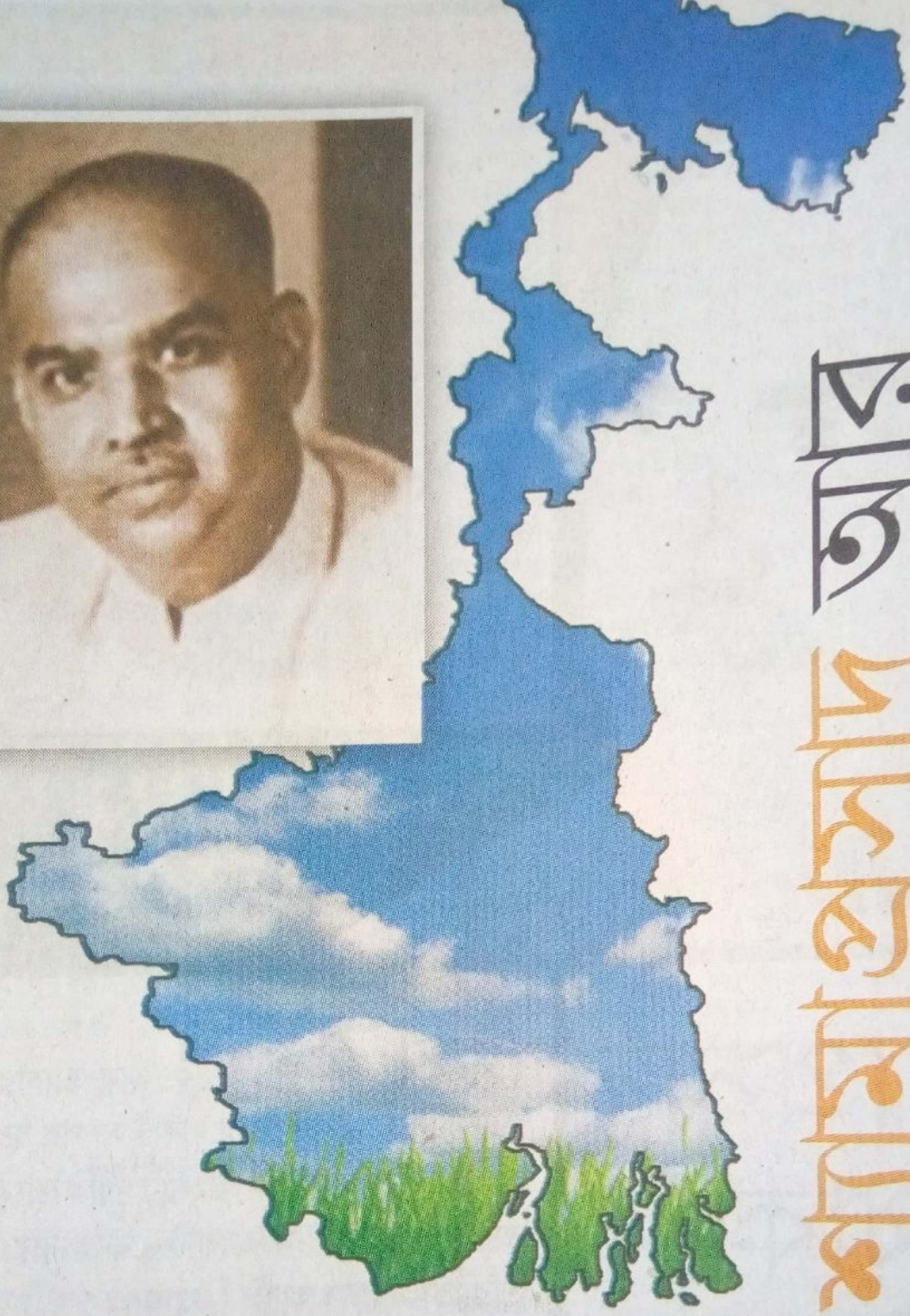

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

১৯৪৭ সালে বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগের ভিতর দিয়ে ভারত ভাগ পর্বটি সম্পন্ন হয়। অখণ্ড ভারত ভাগ হয়ে জন্ম নেয় দুটি রাষ্ট্র। কোরান ভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত। অবিভক্ত বাংলার পূর্ব অংশটি পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। পশ্চিম অংশটি থেকে যায় ভারতে। সেই পশ্চিম অংশই পশ্চিমবঙ্গ। কেন, কীভাবে মুসলিম লিগের আগ্রাসী থাবা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে আনা গিয়েছিল, কোন ব্যক্তি অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার চিন্তা কথা করে, প্রায় একক শক্তিতে লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির জন্মদানে সমর্থ হয়েছিলেন— ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সে পর্ব সম্পর্কে নিরপেক্ষ এবং যথাযথ আলোকপাতের অভাবই কিন্তু দেখা যায়। যদি ইতিহাসের এই পর্বটি নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা যায়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে আজকের পশ্চিমবঙ্গের জনক জনসংঘ নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বস্তুত শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গকে হয়তো ভারতের ভিতর রাখাই সম্ভবপর হত না। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবনটি খুবই সংক্ষিপ্ত। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৩— এই সময়টুকুই ছিল শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বছর। কিন্তু এই স্বল্প রাজনৈতিক জীবনে তাঁর বাগ্মীতা, আপসহীন মনোভাব, সাংসদ হিসাবে নজরকাড়া ভূমিকা, সর্বোপরি দূরদর্শিতা— শ্যামাপ্রসাদকে জাতীয় রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র এবং সুউচ্চ অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই স্বল্প রাজনৈতিক



Scanned by CamScanner

জীবনে দুটি বিষয়ের জন্য শ্যামাপ্রসাদ চিরকালই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রথমত, স্বাধীনতা পর্বে মহম্মদ আলি জিন্নাহর থাবা থেকে পশ্চিমবাংলাকে ছিনিয়ে আনা। এবং দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর পরই কাশ্মীরে ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শেখ আবদুল্লার কারাগারে মৃত্যু বরণ।

কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন দেশভাগের পাশাপাশি বঙ্গবিভাগ জরুরি তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ইতিহাসের পৃষ্ঠা একটু উলটে দেখতে হবে। দুই ব্রিটিশ রাজপুরুষ লর্ড মিন্টো এবং লর্ড কার্জনের মদতে ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মুসলিম লিগ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করে নেয়। অর্থাৎ, জন্মলগ্ন থেকেই মুসলিম লিগ ভারতের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার মানসিকতা দেখিয়েছিল। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস লখনউ চুক্তি স্বাক্ষর করে মুসলিম লিগের এই অদ্ভুত দাবিটি মেনে নেয় এবং রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। ১৯২০-র আগস্ট মাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এর আগের বছরই এদেশে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তুরস্কের খালিফার সমর্থনে সহিংস খিলাফত আন্দোলন শুরু করেছিল। এই খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যদিও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও যোগসূত্র ছিল না, তবু গান্ধী এই খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন এবং একেও স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই দেখাতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর এই ধরনের রাজনীতির বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই। গান্ধী ভেবেছিলেন খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর বদলে অসহযোগ আন্দোলনকে মুসলিম নেতারা সমর্থন জানাবেন। কার্যক্ষেত্রে হল উলটো। মুসলিম নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনকে তো সমর্থন জানালেনই না— বরং তাঁরা নিজেদের পৃথক দাবি-দাওয়া নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব আরও পরিষ্কার হয় তিরিশের দশকে। ১৯২৯-এর মার্চ মাসে মহম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য পৃথক ১৪টি দাবি পেশ করেন। আর ১৯৩০-র ডিসেম্বরে এলাহাবাদে মুসলিম লিগের সম্মেলনে উর্দু কবি ইকবাল মুসলিমদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবি তোলেন। ১৯৩০-এ ইকবালের তোলা সেই দাবিই ক্রমে পাকিস্তান প্রস্তাবের চেহারা নেয়।

ইকবালের এই দাবির ভিতরে যে ভবিষ্যতের বিষবৃক্ষ লুকিয়ে আছে, তা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতেই পারেননি। ইকবাল জার্মানিতে গিয়ে ইসলাম শাস্ত্র সম্পর্কে পড়াশোনা করে এসেছেন। 'আমরা মুসলমান, সমগ্র বিশ্বই আমাদের'— এরকম গান লিখছেন। সেই ইকবাল যখন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি তোলেন, তা যে নিছক নির্দোষ দাবি নয় তা বুঝেছিলেন বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর। ১৯৩০ সালে নভেম্বরে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নেয় কংগ্রেস, তখন আম্বেদকর ছুটে যান গান্ধীর কাছে। তাঁকে বলেন, 'কংগ্রেস যেন গোল টেবিল বৈঠক বয়কট না করে। কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করলে ইকবালের মতো 'বিচ্ছিন্নতাকামী'রা পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসবে।'

এই পর্বের পর কিছুদিনের জন্য মুসলিম লিগের আন্দোলনে ভাঁটা


মাতৃত্বের স্বপ্নপূরণ !

সফলতার হার উল্লেখযোগ্য

Dr. Indrani Lodh
MS, OBGYN
Medical Director
Urvaraa IVF

IVF কখন প্রয়োজন ?

১. স্বামীর Sperm Count যদি কম অথবা শূণ্য থাকে।
২. স্ত্রীর Egg যদি না তৈরী হয় অথবা অনিয়মিত Period হয়।
৩. Polycystic ovaries এ নিঃসন্তানতা।
৪. Endometriosis চিকিৎসার পরও নিঃসন্তানতা।
৫. Period বন্ধ হয়ে গেছে (Menopause)।
৬. 3-4 বার IUI করেও ফল হয়নি।
৭. Unexplained Infertility থাকলে IVF এ লাভ হয়।
৮. জরায়ু অথবা Ovary তে TB (Tuberculosis) থাকলে।
৯. 2-3 বার নিরন্তর Miscarriages হয়ে থাকলে।
১০. Fallopian Tube এ Block থাকলে।
১১. প্রথম সন্তানের পর দ্বিতীয় সন্তান আসতে দেরী হলে।
১২. Ligation এর পর বাচ্চা চাই।
১৩. Hysterectomy র পর বাচ্চা চাই (Surrogacy)।
১৪. স্বামী যদি দূরে থাকে (Sperm freezing)।
১৫. অবিবাহিত স্ত্রী অথবা পুরুষ যদি সন্তান চায় (Donor gamete)।
১৬. পুরুষ অথবা স্ত্রীর genetic সমস্যা থাকলে।

URVARAA IVF

40/1A, Hazra Road, 1st Floor, Kolkata-19
Near Ritchie Road, Hazra Road Crossing
Helpline: 033 2475 5000 / 6000, +91 9830175415


Scanned by CamScanner

ব্রিটিশ গভর্নর জন হারবার্টের প্ররোচনায় পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা শুরু করে মুসলিম লিগ। ঢাকায় হিন্দুদের ওপর হামলা শুরু হয়। এই হামলার সংবাদ যেন প্রকাশ না পায়, তার জন্য গভর্নর জন হারবার্ট ভারত রক্ষা আইনে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। শ্যামাপ্রসাদ পূর্ববঙ্গে মুসলিম লিগের এই হামলার খবর শোনামাত্র সেখানে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। প্রথমে তাঁকে সেখানে যাওয়ার অনুমতিই দেওয়া হয়নি। পরে অবশ্য অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সময় ঢাকায় যাওয়ার পরিবহণও বন্ধ ছিল। শুধু একটি বিশেষ বিমানে খাজা নিজামুদ্দিন ও অন্য কয়েকজন মুসলমান মন্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ গভর্নর জন হারবার্টকে অনুরোধ করেন, ওই বিমানে তাঁর জন্যও যেন একটি আসন রাখা হয়। কিন্তু তিনি বিমানবন্দরে পৌঁছনর আগেই ওই বিমানটি গভর্নরের নির্দেশে মুসলমান মন্ত্রীদের নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যায়। একটি বেসরকারি বিমান জোগাড় করে শ্যামাপ্রসাদ অবশেষে ঢাকায় পৌঁছলেন। কিন্তু ঢাকায় পৌঁছনর পর সেখানকার ডেপুটি কমিশনার তাঁকে শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে চাননি। এমনকী তাঁকে কোনও পুলিশি নিরাপত্তাও দিতে চাননি। শ্যামাপ্রসাদ কিছুটা জোর করেই শহরে প্রবেশ করেন এবং নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। বস্তুত, সেদিনই শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন, মুসলিম লিগের শাসনে বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠী মোটেই নিরাপদ নয়। বরং, মুসলিম লিগের শাসনে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। শ্যামাপ্রসাদের অনুমান যে কিছুমাত্র ভুল ছিল না, তার প্রমাণ মিলেছিল কয়েকবছর পরই, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে, মুসলিম লিগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন।

ফিরে আসা যাক ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের কথায়। জিন্নাহ তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলাকে। এর কারণ ছিল মূলত দুটি। প্রথমত, অবিভক্ত বাংলায় তখন মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ তারা। এছাড়া দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, বাংলায় তখন শহিদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগ ক্ষমতায়। সোহরাওয়ার্দি দাঙ্গাবাজ হিসাবে পরিচিত। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন '(সোহরাওয়ার্দি) ১৯২৬-এ নিজের শ্বশুর মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য কলকাতায় দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলেন,...কলকাতার নিম্নশ্রেণির দরিদ্র বেকার মুসলমান, পশ্চিমা মুসলমান, সমাজ-বিরোধী মুসলমান, সরকারি পুলিশ তো তাঁর হাতে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য।' অতএব বাংলাকে বেছে নেওয়া হল ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ক্ষেত্র হিসাবে আর এই ডাইরেক্ট অ্যাকশনকে সফল করার দায়িত্ব দেওয়া হল সোহরাওয়ার্দিকে।

পাকিস্তান আদায়ের দাবিতে এই সময় মুসলিম লিগ কতটা আগ্রাসী এবং মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ ওই সময় মুসলিম লিগের বিভিন্ন প্রচারপত্র। একটি প্রচারপত্রে জিন্নাহর তরবারি হাতে একটি ছবি দিয়ে লেখা হয়েছিল—'স্বর্গেও ইসলামের তরবারি সূর্যকিরণের ন্যায় জ্বলজ্বল করবে এবং সব অশুভ পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবে। আমরা মুসলমানরা রাজমুকুট পরে দেশশাসন করেছি। উৎসাহ হারিও না। প্রস্তুত হও এবং হাতে অস্ত্র তুলে নাও। হে মুসলমানগণ, একবার ভেবে দেখ আমরা আজ কাফেরদের অধীন। কাফেরদের ভালোবাসার পরিণাম ভালো নয়। হে কাফেরগণ! সুখ বা গর্ব অনুভব কর না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারির দ্বারা জয়ের বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।'

আর একটি প্রচারপত্রে বলা হয়—'যারা চোর, গুণ্ডা, চরিত্র বলে বলীয়ান নয়, যারা নামাজ পড়ে না—তারাও এসো। স্বর্গের আলোকজ্জ্বল দরজা তোমাদের জন্যও খোলা আছে। এসো আমরা হাজারে হাজারে সেখানে প্রবেশ করি। এসো পাকিস্তান আদায়ের জন্য, মুসলিম জাতির জয়ের জন্য এবং যেসব সেনারা জেহাদ শুরু করেছে তাদের জয়ী করার জন্য চিৎকার করে মোনাজাত করি।' আর স্বয়ং জিন্নাহ বললেন—'আমার হাতে পিস্তল আছে, এবং তা ব্যবহার করব। আমি কোনও নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছি না।' খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, 'আমরা যখন অহিংসায় বিশ্বাস করি না, তখন একশো পথে যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে জানি। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে কী বোঝায় তা বাংলার মুসলমানরা ভালোই জানে।' লিয়াকত আলি খান বললেন—'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে বোঝায় আইন ভেঙে যে কোনও কাজ করা।' মুসলিম লিগ নেতারা কী চাইছিলেন, কী করতে চলেছিলেন এইসব প্রচারপত্র এবং কথাবার্তা থেকেই তা পরিষ্কার।

কী করতে চাইছিলেন মুসলিম লিগ নেতৃত্ব—তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। ওইদিন মুসলিম লিগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলকাতার রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আজরাইল বাহিনী। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান আদায়ের লক্ষ্যে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মুসলিম লিগ গঠন করেছিল মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। চলতি ভাষায় এদের বলা হত আজরাইল বাহিনী। এই আজরাইল বাহিনীর কোনও রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল না। কট্টর মৌলবীদের কথায় এরা পরিচালিত হত। সেই সময় পাঞ্জাবের ছোটলাট জেনকিন্স এই আজরাইল বাহিনীকে হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মুসলিম লিগ নেতা লিয়াকত আলি খাঁ বলেছিলেন, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের ওপর কোনও আক্রমণ মুসলিম লিগের ওপর আক্রমণ বলে ধরে নেওয়া হবে। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬, এই আজরাইল বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হল কলকাতা শহর। মুসলিম লিগের প্রধানমন্ত্রী শহিদ সোহরাওয়ার্দি পুলিশকে একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখলেন। নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল সেনাবাহিনীকেও। পুলিশ বাহিনী থেকে হিন্দু পুলিশ অফিসারদের বদলি করা হয়েছিল দূরে। তিনদিন ধরে আজরাইল বাহিনীর নেতৃত্বে কলকাতা শহরে চলল অবাধ হিন্দু ও শিখ নিধন। অবাধে চলেছিল লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ। পাঁচ হাজার হিন্দু ও শিখ পুরুষ-রমণী এই হামলায় নিহত হয়। কলকাতার রাজপথে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে মৃতদেহ। এই ঘটনাকেই পরে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অমলেশ ত্রিপাঠীর লেখা থেকে জানা যায়, লর্ড ওয়াভেল বলেছিলেন, 'পলাশীর যুদ্ধের থেকেও বেশি লোক মারা গিয়েছিল কলকাতার দাঙ্গায়।' আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে লিখেছিলেন—'কলকাতা শহরে যখন নির্বিচারে নারী ও পুরুষ খুন হচ্ছিল, তখন পুলিশ-মিলিটারি চুপ করে ছিল।'

দ্য লাস্ট ডেজ অফ ব্রিটিশ রাজ গ্রন্থে লিওনার্ড মোসলে লিখেছেন—'১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের ওই কুৎসিত ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড কলকাতাকে ৭২ ঘণ্টার জন্য বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। চৌরঙ্গী স্কোয়ারে নারী-পুরুষ শিশুদের পচাগলা দেহগুলি নর্দমায় পড়েছিল। শকুন ঠুকরে খাচ্ছিল লাশগুলো। এই ঘটনাই ভারত ইতিহাসের গতি বদল করে দিয়েছিল।' জিন্নাহ-র মুসলিম লিগ যখন কলকাতায় এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করছিল, তখন জওহরলাল নেহরু কী করছিলেন? নেহরু তখন মুম্বাইতে জিন্নাহ-র সঙ্গে বৈঠকে বসে রাজনৈতিক দর কষাকষিতে ব্যস্ত ছিলেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের এই ভয়াবহ গণহত্যার উল্লেখ করেই তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধীকে বুঝিয়েছিলেন ভারত ভাগ কেন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মাউনব্যাটেন তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'গান্ধীজি আমাকে বলেছিলেন আমি যেন স্বপ্নেও ভারত ভাগ করার কথা না ভাবি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, অন্য কোনও পথ পেলে আমি কোনও



Scanned by CamScanner

ক্রমেই ভারত ভাগের দিকে যাব না। কিন্তু আপনি ১৬ আগস্টের কথা ভুলে যাবেন না। সেদিন কেবল মহড়া হিসাবে জিন্নাহ কলকাতায় পাঁচ হাজার লোককে খুন করেছিলেন এবং পনেরো হাজারকে আহত করিয়েছিলেন। আমি মনে করি, জিন্নাহকে এখন থামিয়ে দিতে না পারলে তিনি গৃহযুদ্ধ বাঁধাবেন। এ ক্ষমতা তাঁর আছে। উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।'

তবে বিস্ময়কর ছিল গান্ধীর প্রতিক্রিয়া! সবাই যখন মুসলিম লিগের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করছেন, গান্ধী তখন বললেন, 'আমার নীরব থাকাই এখন বাঞ্ছনীয়।' নিন্দা তো করলেনই না, বরং এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বসলেন তিনি। বললেন, 'আমরা ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যাই। এটা উচিত নয়। যারা পালিয়ে যায় ঈশ্বরের ওপর তাদের বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর যখন আমাদের অন্তরে আছেন, তখন পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়? মানুষ যখন মারা যায় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এটা ঘটে। আমাদের যদি কেউ পেটায়, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরই এটা ঘটান।'

কিন্তু জিন্নাহর সমস্যা হয়েছিল অন্যত্র। জিন্নাহ মনে করেছিলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর, তার ভয়াবহতা দর্শন করে হিন্দু নেতৃত্বের ভিতর থেকেই ভারত বিভাজনের দাবি উঠবে। পাকিস্তান দিয়ে দেওয়ার পক্ষে আর কেউই তেমন আপত্তি করবেন না। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গার পরও হিন্দু সমাজের ভিতর থেকে ভারত ভাগের তেমন জোরালো দাবি উঠছে না দেখে, জিন্নাহ দ্বিতীয় দফায় আবার ভয়াবহ এক দাঙ্গার পরিকল্পনা করলেন। এবার বেছে নেওয়া হল পূর্ববঙ্গকে। এখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। কলকাতা দাঙ্গার প্রায় দু'মাস পরে ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে লক্ষ্মীপুজোর দিন নোয়াখালিতে গোলাম সরওয়ারের নেতৃত্বে শুরু হল ভয়াবহ হিন্দু নিধন। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। গ্রামের পর গ্রামে চলল অবাধ হত্যা, লুটতরাজ, গণধর্ষণের ঘটনা। তিনহাজার হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ মারা গেল মুসলিম লিগ সমর্থকদের হামলায়।

১৯৪৬-এর ২০ অক্টোবর দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছে—'রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রাইপুর, লক্ষ্মীপুর এবং সেনবাগ থানা এলাকায় গত দশ দিন ধরে ব্যাপক হত্যা, লুট, বাড়িঘর পোড়ানো, মহিলাদের অপহরণ, জোর করে ধর্মান্তরকরণের পর এখন মুসলিম লিগ সমর্থকরা ত্রিপুরা জেলার ফরিদগঞ্জ-চারহাইম-চাঁদপুর এলাকায় ঢুকে পড়েছে। নোয়াখালি জেলায় দখলকৃত এলাকায় পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে যাওয়া হয় তাদের একটি অংশ। উদ্দেশ্য ওখানকার অধিবাসীরা তাদের কর্তৃত্ব মানতে না চাইলে আবার অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে হবে।'

আচার্য জে বি কৃপালনী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর গান্ধীজির পরামর্শে তিনি এবং শরৎচন্দ্র বসু চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। কৃপালনী তখন কংগ্রেস সভাপতি। যাওয়ার পথে কিছু সময়ের জন্য তাঁরা কুমিল্লায় অবস্থান করেন। সেই সময় কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু তাঁদের সঙ্গে দেখা করে পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা দেন। এরপর তাঁরা চট্টগ্রামে গিয়ে গভর্নর বরোজের সঙ্গে দেখা করেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লিগের প্রধানমন্ত্রী শহিদ সোহরাওয়ার্দি। কৃপালনী এবং শরৎ বসুকে গভর্নর বারোজ জানান, সোহরাওয়ার্দি জানিয়েছেন সব ঠিকই আছে। কৃপালনী হিন্দু মহিলাদের অপহরণ এবং ধর্ষণের প্রসঙ্গ জানাতে গভর্নর বলেন, 'এ তো হওয়ারই কথা। কারণ হিন্দু মহিলারা মুসলমান মহিলাদের তুলনায় আকর্ষণীয়।'

১৯৪৬-এর নভেম্বরে গান্ধী নিজে নোয়াখালির দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু গান্ধীর শান্তিবাণীতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা বিশেষ কর্ণপাত করেনি। তার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় ১৯৪৬-এর ১২ নভেম্বর প্রকাশিত দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি রিপোর্টে। স্টেটসম্যানের সংবাদে জানা যাচ্ছে, গান্ধী ওইদিন নোয়াখালির দত্তপাড়া গ্রামে একটি জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন। জনসভায় শ্রোতারা সকলেই মুসলমান। জনসভার শেষে গান্ধীজি মুসলমান শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কি চান না যে, যে সমস্ত হিন্দুরা তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁরা আবার নিজের নিজের গ্রামে ফিরে আসুক এবং আগের মতো পাশাপাশি শান্তিতে বাস করুক।' সভা নীরব। কেউ গান্ধীর কথার কোনও উত্তর দিল না। এরপর গান্ধী বললেন—'আপনার যদি না চান, তবে সেটাও বলুন। আমি হিন্দুদের জানাবো তাঁরা যেন আর এখানে ফিরে আসেন।' এরপরও কোনও উত্তর এল না। স্টেটসম্যান লিখেছে—'The meeting listened to him in silence and then dispersed.'

মুসলিম লিগ যে এইরকম এক রক্তক্ষয়ী হামলা ঘটাতে পারে, তা শ্যামাপ্রসাদ আগেই অনুমান করেছিলেন। ১৯৪০-এর ৬ এপ্রিল শ্রীহট্টে এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, মুসলিম লিগের আন্দোলনকে হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং দেশের অন্য কিছু নেতারা শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যকে সেদিন গুরুত্ব দেননি। মুসলিম লিগের উত্থানের ভিতর ভারতের জন্য কী বিপদ লুকিয়ে আছে—তাও উপলব্ধি করতে পারেননি। যদি পারতেন, তাহলে ১৯৪৬-এ ওই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হয়তো জিন্নাহ সংঘটিত করতে পারতেন না। মুসলিম লিগের রাজনীতির বিপদ শ্যামাপ্রসাদ আগেই অনুধাবন করলেও, ১৯৪৬-সালের দাঙ্গার পর শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি জিন্নাহ গায়ের জোরে আদায় করবেনই। আর তা যতদিন না করতে পারবেন, ততদিন আক্রমণাত্মক রাজনীতি জিন্নাহ চালিয়ে যাবেনই। এই পরিস্থিতিতে ভারত ভাগ অবশ্যম্ভাবী। পাশাপাশি ১৯৪৫ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জওহরলাল নেহরু এবং কংগ্রেসের অন্য নেতারাও চাইছিলেন যে কোনও শর্তে স্বাধীনতা আসুক। নেহরু এবং কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য ছিল 'আমাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর কতদিন আন্দোলন চালাব।' পাশাপাশি ব্রিটিশও তখন চাইছিল দেশভাগ করে স্বাধীনতা দিতে। শ্যামাপ্রসাদ আরও একটি বিষয় সুনিশ্চিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই সময়। ১৯৪৬ এবং তার আগের দাঙ্গাগুলি প্রত্যক্ষ করে এবং মুসলিম লিগের নেতৃত্বদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন, সমগ্র বাংলা যদি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। মুসলিম লিগের পাকিস্তানে তাদের জীবন ও সম্পদ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। শ্যামাপ্রসাদ যে কিছু ভুল বোঝেননি তার প্রমাণ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা। স্বাধীনতার পর থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ২৪ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ এসে পৌঁছেছে। পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু নরনারী নিখোঁজ হয়ে গেছেন। গত সাত দশক ধরেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে এথনিক ক্লিনিজিং বা হিন্দু নিধন চলছেই।

জিন্নাহ চেয়েছিলেন সমগ্র পাঞ্জাব এবং বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক। বলেছিলেন, 'পোকায় কাটা পাকিস্তান আমি চাই না।' কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনের জিন্নাহর এই দাবির প্রতি বিশেষ একটা সমর্থন ছিল না। ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল ভারত ভাগ হলে বাংলা ও পাঞ্জাবও ভাগ হবে। শ্যামাপ্রসাদও চাইছিলেন বাঙালি হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিভক্ত বাংলার যে অংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই অংশটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে। এই দাবি নিয়ে তিনি গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং অন্য হিন্দু নেতাদের কাছে ছুটে গেলেন। তাঁর এই দাবিতে সমর্থনও জানালেন হিন্দু নেতারা। তাঁর দাবি মতো অখণ্ড বাংলা আদায় করা যাবে না বুঝে জিন্নাহ এইসময় একটি নতুন চাল চেলেছিলেন। তাঁর একান্ত অনুগামী শহিদ সোহরাওয়ার্দির মাধ্যমে কিরণশংকর রায় এবং শরৎচন্দ্র বসুকে



Scanned by CamScanner

তিনি এক অলীক স্বতন্ত্র বাংলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিরণশংকর এবং শরৎচন্দ্র জিন্নাহ-সোহরাওর্দির এই চালে ভুলেওছিলেন। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা জন্ম নিলে তার শাসনক্ষমতায় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেবেন। আসলে জিন্নাহর চালটি ছিল অন্য। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, কোনওমতে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখিয়ে অখণ্ড বাংলাকে যদি ভারত থেকে আলাদা করে রাখা যায়, তাহলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু জিন্নাহর এই চালটি শ্যামাপ্রসাদ ধরতে পেয়েছিলেন। ধরতে পেরেই বাংলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি জিন্নাহর কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে সর্বশক্তি পণ করে লড়তে নামলেন তিনি।

শ্যামাপ্রসাদ এরকম চাইলেও তফসিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং তাঁর অনুগামীরা চেয়েছিলেন—ভারত ভাগ হবে এবং সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাব পাকিস্তানে যাবে। মুসলিম লিগের মোহে আচ্ছন্ন যোগেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন জিন্নাহর পাকিস্তানে তাঁরা সুখে-শান্তিতে থাকবেন। যোগেন্দ্রনাথের এই মোহভঙ্গ হতে অবশ্য বেশি দেরি হয়নি। ভারত ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানে মন্ত্রীও হয়েছিলেন তিনি। মুসলিম লিগের হামলা ও অত্যাচারের সামনে অসহায় যোগেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। পালিয়ে আসার আগে পাকিস্তান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে যে পত্রটি লিখেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ, তাতে তিনি স্বীকার করেছিলেন, মুসলিম লিগের চরিত্র তিনি বুঝতে পারেননি।

বাংলার হিন্দু বাঙালিদের জন্য স্বতন্ত্র অবাসভূমির দাবিতে শ্যামাপ্রসাদের এই মরণপণ সংগ্রামের ফল মিলল। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিল প্রথম দফায় বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে জানতে চাওয়া হবে—তারা ভারত ভাগ এবং বাংলা ভাগের পক্ষে কিনা। অর্থাৎ নতুন একটি আইনসভা গঠনের পক্ষে কিনা। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় এই বিষয়ে প্রথম ভোটাভুটি হয়। জিন্নাহ আগেই হুইপ জারি করেছিলেন, তাঁর দলের এমএলএরা যেন ভারত ভাগের পক্ষে এবং বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দেন। ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট আইনসভায় ২১৬ জন ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১২৬ জন ভারত ভাগ এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেন। ভারত ভাগের পক্ষে এবং বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ১২০ জন মুসলমান, ৫ জন তফসিলি হিন্দু এবং ১ জন ভারতীয় খৃস্টান এমএলএ। কমিউনিস্ট এমএলএ-রা কোনও অজ্ঞাত কারণে ভোটদানে বিরত ছিলেন। এখানে উল্লেখ করতেই হয়, কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু জিন্নাহর পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিল।

এই ভোটাভুটির পরই বঙ্গীয় আইনসভা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ও অন্যটি পূর্ববঙ্গ আইনসভা। এরপর পূর্ববঙ্গ আইনসভাতে ভোট নেওয়া হয়। সেখানে ১০০ জন মুসলমান, ১ জন ভারতীয় খৃস্টান এবং ৫ জন তফসিলি এমএলএ সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দেন। অনুরূপভাবে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় ৫৮-২১ ভোটে সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলা ভাগ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। জিন্নাহর কবল থেকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে আনার যে লড়াই শুরু করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ—এই ভোটভুটির মাধ্যমে তা সাফল্য অর্জন করল। যে কারণেই গর্বভরে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন—'জিন্নাহ ভারতকে ভাগ করেছেন। আর আমি পাকিস্তানকে ভাগ করে দিয়েছি।' ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বলতেই হবে, পশ্চিমবঙ্গের জন্মই হয়েছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালির নিজস্ব আবাসভূমি হিসাবে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ আদায়েই অবশ্য শ্যামাপ্রসাদের দাবি সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্যামাপ্রসাদের দাবি ছিল, পাঞ্জাব এবং বাংলায় সংখ্যালঘু বিনিময় হোক। শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি ছিল, সংখ্যালঘু বিনিময় হলে পাকিস্তানে অবস্থানকারী হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ হবে। কিন্তু গান্ধী এবং নেহরু শ্যামাপ্রসাদের এই যুক্তিকে আমল দিতে চাননি। গান্ধী বলেছিলেন—'লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবতেই পারছি না।' তবে গান্ধী আর নেহরু না বুঝলেও দূরদর্শী আম্বেদকর বুঝেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা। আম্বেদকর বলেছিলেন—'এ কথা সন্দেহাতীত যে সংখ্যালঘু বিনিময়ই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার।' গান্ধী এবং নেহরুর এই মনোভাবের সমালোচনা করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন—'যখন স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল তখন পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, যত সংখ্যক হিন্দু বিতাড়িত হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে সেই সংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠাইয়া নবাগত হিন্দুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জওহরলাল নেহরু গান্ধীজির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, 'ইহা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাজ্যে অসম্ভব।' প্রধানমন্ত্রী (নেহরু) বিধানচন্দ্র রায়কে নির্দেশ দিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। যে দুখানি চিঠিতে নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিরকাল মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর দুরপনেয় কলঙ্ক ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে।'

> বাংলার হিন্দু বাঙালিদের জন্য স্বতন্ত্র অবাসভূমির দাবিতে শ্যামাপ্রসাদের এই মরণপণ সংগ্রামের ফল মিলল।

স্বাধীনতার পরও শ্যামাপ্রসাদ পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। ১৯৫২ সালে নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতায় পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু সম্মেলন আয়োজন করেন। ওই সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন সুচেতা কৃপালনী। সংসদে তাঁর বক্তৃতাগুলিতেও বারবার শ্যামাপ্রসাদ এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'যদি পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য ওই এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তাহলে একদিন ভারতকে সেকথা ভেবে দেখতে হবে।' পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়নের উল্লেখ করে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, 'যদি এক তৃতীয়াংশ লোককে, যারা ঘটনাক্রমে হিন্দু, বিতাড়িত করা হয়, তাহলে পাকিস্তানকে ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে। পাকিস্তানের এলাকা পুনরায় ভাগ করতে হবে এবং ওইসব মানুষকে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিতে হব।'

পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত হিন্দুদের নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ অবশ্য দীর্ঘ লড়াই চালাতে পারেননি। কেননা, ১৯৫৩-র ২৩ জুন কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। তবু, ভারত ভাগের ইতিহাস, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জন্মের ইতিহাস যতবার লেখা হবে, ততবারই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। কেননা, তিনিই এই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদাতা। বাঙালি হিন্দুর তিনিই রক্ষাকর্তা। এ সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই।



Scanned by CamScanner

# পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দুদের পাশেও ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুধু যে বাংলার হিন্দুদের আবাসভূমি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদাতা, তাই-ই নন— বরং, স্বাধীনতার পরও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আমৃত্যু আন্দোলনও চালিয়ে গিয়েছেন। এমনকী পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দুদের পুনর্বাসনের দাবিতে অনড় থেকে তিনি ১৯৫০ সালে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগও করেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বেই শ্যামাপ্রসাদ আশঙ্কা করেছিলেন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এই আশঙ্কা শ্যামাপ্রসাদের হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রতি মুসলিম লিগের ঘৃণার মনোভাব প্রত্যক্ষ করে। এই একই আশঙ্কা বাবাসাহেব আম্বেদকরেরও ছিল। এই আশঙ্কা থেকেই শ্যামাপ্রসাদ দাবি তুলেছিলেন, দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু বিনিময়ও করা হোক। সংখ্যালঘু বিনিময় হলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কমবে— এই যুক্তিও দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু—কেউই সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাবে রাজি হননি। রাজি না হয়ে, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীকে কী ভয়ংকর বিপদের মুখে তাঁরা ঠেলে দিয়েছিলেন, তা বোঝা গিয়েছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই।

স্বাধীনতার সময় ভারত ভাগের শর্ত হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, দুই দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি সমান আচরণ করা হবে। ভারত এই শর্ত কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। পাকিস্তানের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হল। পাকিস্তান যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন-সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রদান করতে মোটেই আন্তরিক নয়—তা প্রমাণ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কাও সত্যে পরিণত হল। ১৯৪৯-এর আগস্ট থেকে ১৯৫০-এর মার্চ মাস পর্যন্ত পরিকল্পিত এবং সংগঠিতভাবে হিন্দুদের ওপর হামলা চালাল মুসলিম লিগ। এই হামলার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা সমেত একটি স্মারকলিপি তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে দিয়েছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ বসন্তকুমার দাস, গণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মুণীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, হারাণচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার এবং মনোরঞ্জন ধর। এঁদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৪৯-এর আগস্ট মাসে শ্রীহট্ট জেলার বিয়ানিবাজার এবং বরলেখা থানায় একতরফাভাবে হিন্দু নিধন শুরু হয়। অবস্থা চরমে পৌঁছয় ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারির ৬ এবং ৭ তারিখ পাকিস্তান রেডিও থেকে পরিকল্পিতভাবে প্রচার করে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। এর পরই, ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে পরিকল্পিতভাবে চারজন মুসলমান মহিলাকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে, তাদের কাপড়ে লাল রং লাগিয়ে ঢাকায় সচিবালয়ের চারপাশে ঘোরানো হয়। প্রচার করা হয়, কলকাতায় এদের ধর্মান্তরকরণ করে অত্যাচার করা হয়েছে। এর পরই সচিবালয়ের কর্মীরা অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়। ওই সমাবেশ থেকেই উন্মত্ত জনতা ঢাকা শহরে হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রমণ করতে শুরু করে। হিন্দুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট

স্বাধীনতার সময় ভারত ভাগের শর্ত হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, দুই দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি সমান আচরণ করা হবে। ভারত এই শর্ত কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

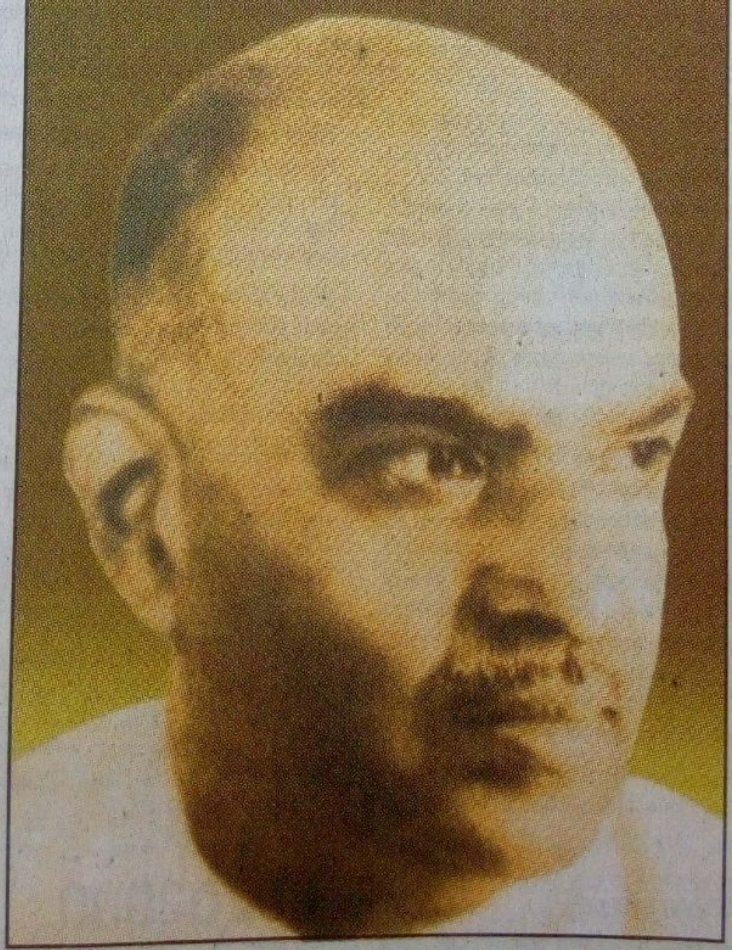



Scanned by CamScanner

করা হয়। হিন্দু মহিলাদের অবাধে ধর্ষণ করা হতে থাকে। ট্রেন ও স্টিমারে করে যেসব হিন্দু ঢাকায় আসছিলেন তাঁদের খুন করা হয়। ঢাকা ছাড়াও শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি সর্বত্র শুরু হয়ে যায় হিন্দু নিধন। এই ভয়াবহ হিন্দু নিধনের কয়েক মাস পরেই তফশিলি নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডল, যিনি দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা বলে পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন এবং পাকিস্তানে মন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনিই পাক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে আসেন। ভারতে পালিয়ে আসার আগে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে যোগেন্দ্র মণ্ডল যে পত্রখানি লেখেন, তাতে তিনি পরিষ্কার লিখেছিলেন, পাকিস্তানে হিন্দুদের সবদিক থেকে বঞ্চিত করে তাদের রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে।

পাকিস্তানের এই হত্যালীলার ব্যাপকতা অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে আলোচনার জন্য দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান। লিয়াকত আলি নেহরুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দিল্লিতে আসেন এবং সাতদিন দিল্লিতে অবস্থান করেন। এই সময়ই নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে বলা হয়, উভয় সরকার নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের যাবতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে যাতে সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য না হয় এবং ইতিমধ্যে যারা দেশত্যাগ করেছে তাদের দেশে ফিরে যেতে উৎসাহ দেওয়া হবে। লিয়াকত আলি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। লিয়াকত আলি দিল্লি এসেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে পাকিস্তানে হিন্দু উচ্ছেদের ফলে ভারত কোনওরকম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তা সুনিশ্চিত করতে। এই চুক্তিতে সই করিয়ে কার্যত নেহরুকে বোকা বানিয়ে লিয়াকত আলি পাকিস্তান ফিরে গেলেন। এর পরই লিয়াকত আলি পাকিস্তান থেকে হিন্দু উচ্ছেদের জন্য আরও পুরোদমে নেমে পড়লেন। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির কিছুদিন পরেই পাকিস্তানে একটি গোপন সার্কুলারে পূর্ব পাকিস্তানের সবকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেওয়া হল—কোনও অমুসলমান ব্যক্তিকে চাকরিতে নিয়োগের আগে যেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন নেওয়া হয়। আর একটি সার্কুলারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বলা হয়, হিন্দুদের ছেড়ে যাওয়া জমি-জায়গা তাদের ফিরিয়ে না দিয়ে তা যেন মুসলমানদের ভিতর বিলি বণ্টন করে দেওয়া হয়। এই সার্কুলারটি পাকিস্তান সংবিধান সভায় পূর্ববঙ্গের সদস্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছিলেন। নেহরু-লিয়াকত চুক্তিকে কার্যত বাজে কাগজের ঝুড়িতে পরিণত করে পাকিস্তান।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তি যে কোনও কাজেই আসবে না, বরং এই চুক্তি পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে আরও বিপদের মুখেই ঠেলে দেবে—তা অনুধাবন করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, নেহরু পূর্ববঙ্গের ১ কোটি ১১ লক্ষ হিন্দুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। সেই সময় নেহরু মন্ত্রিসভার অন্তত চারজন মন্ত্রী নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া বাকিরা হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বি আর আম্বেদকর এবং ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। সর্দার প্যাটেল অবশ্য শেষ পর্যন্ত নেহরুকে সমর্থন করেছিলেন। আম্বেদকর নীরব ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ এবং ক্ষিতীশচন্দ্র এই চুক্তির বিরোধিতা করে নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ১৯৫০-এর আগস্টে সংসদে সুদীর্ঘ ভাষণে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন—তিনটি উপায়ে ভারত-পাকিস্তানের ভিতর শরণার্থী সমস্যার সমাধান হতে পারে। এক, ভারত-পাকিস্তানের পুনর্মিলন, দ্বিতীয়ত দুই দেশের ভিতর সংখ্যালঘু বিনিময় এবং তিন, ভারত ও পাকিস্তানের ভিতর সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিজেদের বিন্দুমাত্র নিরাপদ বোধ করেননি। বরং উত্তরোত্তর তাদের উপর যেভাবে হামলার সংখ্যা বাড়ছিল, তাতে তারা অসহায় অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নিতে চলে আসছিল। ফলে, শরণার্থীর ঢল অব্যাহতই রইল। এরই ভিতর ১৯৫১-য় রাওয়ালপিণ্ডিতে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালেন লিয়াকত আলি। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতকে দায়ী করে পাক পত্র-পত্রিকাগুলিতে চড়া সুরের ভারত-বিরোধী প্রচার শুরু হয়। ফলে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়ে। ১৯৫২-র মে মাসে সংসদে শ্যামাপ্রসাদ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কথা উল্লেখ করে নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। নেহরু কোনও সদর্থক উত্তর তো দিলেনই না। উলটে বলে বসলেন, ভারতেই সংখ্যালঘুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। কার্যত পাকিস্তানের হাতে আরও অপপ্রচারের অস্ত্র তুলে দিলেন নেহরু।

> পাকিস্তানের এই হত্যালীলার ব্যাপকতা অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে আলোচনার জন্য দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান। লিয়াকত আলি নেহরুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দিল্লিতে আসেন এবং সাতদিন দিল্লিতে অবস্থান করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর আর একটি আঘাত নেমে এল দুই দেশের ভিতর পাসপোর্ট-ভিসা ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার ফলে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, তাদের ভারতে পালিয়ে যাওয়া আটকাতেই পাসপোর্ট প্রথার প্রবর্তন করা হচ্ছে। ফলে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন হওয়ার আগেই তারা দলে দলে ভারতে চলে আসার জন্য সীমান্তের দিকে পালিয়ে আসতে শুরু করল। দলে দলে হিন্দু শরণার্থী ভারতভূমিতে প্রবেশ করায় এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অত্যাচারের কাহিনি বিবৃত করার ফলে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশে আলোড়নের সৃষ্টি হল। বিচলিত শ্যামাপ্রসাদ এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু করার বিরোধিতা করলেন।

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি সুস্পষ্ট নীতি নিতে বললেন, যাতে পাকিস্তান হিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রতি সুসভ্য আচরণ করে। শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে বললেন, পশ্চিমবঙ্গে এসে হিন্দু শরণার্থীদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে যেতে।

১৯৫২-র ১৫ অক্টোবর থেকে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তিত হল। এর ফলে আর একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু যারা নিজেদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল তারা চরম অবস্থার ভিতর পড়ল। খোলা আকাশের নিচে, রেল স্টেশনে, ফেরিঘাটে তাদের ঠাঁই হল। পাকিস্তানিরা তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করল। মেয়েদের ধরে নিয়ে গেল। পাসপোর্টের নিয়মকানুন এতই জটিল করা হয়েছিল যে, এইসব সাধারণ মানুষের পক্ষে পাসপোর্ট সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদের আবেদনকে সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গ



Scanned by CamScanner

সরকারের পক্ষ থেকেও নেহরুকে অনুরোধ করা হল পশ্চিমবঙ্গে এসে হিন্দু শরণার্থীদের অবস্থা দেখে যাওয়ার জন্য। ১৯৫২-র ১৯ অক্টোবর নেহরু পশ্চিমবঙ্গে এলেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ সহ একটি স্মারকলিপি দিলেন। শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে বলেন, প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। তাতেও যদি পাকিস্তান সতর্ক না হয়, তাহলে চরম উপায় অবলম্বন করতেই হবে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের আবেদনে নেহরু কর্ণপাত করলেন না।

শ্যামাপ্রসাদ বুঝে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় নেহরু উদ্যোগী হবেন না। শ্যামাপ্রসাদ তখন পশ্চিমবঙ্গের সব অকংগ্রেসি এবং অবামপন্থী দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেন। ঠিক করলেন, এই সম্মেলন থেকেই পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত হিন্দুদের বিষয়ে একটি সর্বসম্মত নীতি গ্রহণ করা হবে। কংগ্রেস যে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আসবে না, তা জানাই ছিল। বামপন্থীরা, যারা একসময়ে পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থন করেছিল, তারাও পাকিস্তানেরই হাত শক্ত করল এবারও। বামপন্থীরা প্রস্তাব করল, পাকিস্তানে একটি শুভেচ্ছা মিশন পাঠানো হোক। সেই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সহযোগীদের বিরোধিতা শুরু করল বামপন্থীরা। কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে এবং দিল্লির গান্ধী ময়দানে শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে বিশাল জনসভা হল। এই জনসভায় উপস্থিত হয়ে আচার্য জে বি কৃপালনী পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি নেহরুর ঔদাসীন্যের তীব্র সমালোচনা করলেন। শ্যামাপ্রসাদ ওই জনসভায় বললেন, আমাদের নিজেদের সরকারের দুর্বলতা ও দোদুল্যমানতাই পাকিস্তানকে এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ করার সাহস জোগাচ্ছে। যদি ভারত সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করে এবং পাকিস্তান বুঝতে পারে যে তাদের কার্যকলাপের পরিণাম স্বরূপ তাদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে আঘাত আসবে, তাহলে তারাও সতর্ক হবে।

১৯৫২-র ১ ও ২ নভেম্বর কলকাতায় সর্বভারতীয় পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু সম্মেলনের আয়োজন করলেন শ্যামাপ্রসাদ। এই সম্মেলনে সভানেত্রিত্ব করলেন সুচেতা কৃপালনী। এই সম্মেলন থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে যে, সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করুক। পাকিস্তানে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হোক। এবং দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা-পাসপোর্ট ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হোক। ২৩ নভেম্বর সারা দেশে 'সর্বভারতীয় পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। এই প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ ছাড়াও ছিলেন সুচেতা কৃপালনী, এন সি চ্যাটার্জি, মাস্টার তারা সিং, জেনারেল মোহন সিং, ফরওয়ার্ড ব্লকের আর এস রুইকর, পেজান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির এস এস মোরে এবং শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশনের রাজভোজ প্রমুখ।

১৯৫২-র ১৫ নভেম্বর সংসদে শ্যামাপ্রসাদ একটি সুদীর্ঘ ভাষণে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দুর্দশার কথা আরও একবার তুলে ধরেন। সংসদেই নেহরুর পাকিস্তান তোষণ নীতির সমালোচনা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, 'আমি আশ্চর্য হই এটা দেখে—নেহরু বলতে পারেন, আমি কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। আমি সে ব্যাপারে সহানুভূতি দেখাতে পারি। কিন্তু তিনি তো এই তোষণকে গৌরবান্বিত করছেন এবং তোষণ চালিয়েই যাচ্ছেন। এর মূল্য কে দিচ্ছে? তিনি যদি নিজেই এর মূল্য দিতেন, তাহলে আমার কিছু বলার ছিল না। যদিও তার জন্য আমি দুঃখিত হতাম। কিন্তু জাতির মূল্যে তোষণ করার কী অধিকার তাঁর আছে? এটা ভারতের সম্মান ও আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। ভয়ংকর সর্বনাশ রোধ করার জন্য একটা কিছু করতেই হবে।'

এরই ভিতর কাশ্মীরে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠল। নেহরুর কৃপাধন্য শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করতে শুরু করেছিলেন। কাশ্মীরের পরিস্থিতিও বিচলিত করে তুলেছিল শ্যামাপ্রসাদকে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্নতাবাদের কবল থেকে মুক্ত করার আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাংলার এবং সমগ্র ভারতের দুর্ভাগ্য ১৯৫৩-র ২৩ জুন কাশ্মীরে বন্দি অবস্থায় খুন করা হল তাঁকে। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ভারতের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ যে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন, তা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়নি। বরং বামপন্থী এবং নেহরুপন্থী ঐতিহাসিকরা শ্যামাপ্রসাদকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে হেয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথই পরবর্তী সময়ে বুঝিয়ে দিয়েছে কতটা দূরদর্শী, কতটা সঠিক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদের অভাব ভারত অনুভব করবে চিরকাল।

**র. সে**

শ্যামাপ্রসাদ বুঝে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় নেহরু উদ্যোগী হবেন না। শ্যামাপ্রসাদ তখন পশ্চিমবঙ্গের সব অকংগ্রেসি এবং অবামপন্থী দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেন। ঠিক করলেন, এই সম্মেলন থেকেই পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত হিন্দুদের বিষয়ে একটি সর্বসম্মত নীতি গ্রহণ করা হবে। কংগ্রেস যে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আসবে না, তা জানাই ছিল। বামপন্থীরা, যারা একসময়ে পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থন করেছিল, তারাও পাকিস্তানেরই হাত শক্ত করল এবারও। বামপন্থীরা প্রস্তাব করল, পাকিস্তানে একটি শুভেচ্ছা মিশন পাঠানো হোক। সেই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সহযোগীদের বিরোধিতা শুরু করল বামপন্থীরা।



Scanned by CamScanner